International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VII, Issue-II, March 2021, Page No. 1-21
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v6.i4.2020.1-8

রাশিয়ার চিঠি ও আমার দেখা নয়াচীনঃ বিপ্লবোত্তর রাশিয়া ও চীনে নবজাগরণের তুলনামূলক স্বরূপ পর্যালোচনা

ফাতেমা বেগম
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ
মোঃ এমদাদুল হক
প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ

Abstract

Though the goal of the litterateur like Rabindranath Tagore (1861-1941) is to reflect the world and life through his literary work with a view to creating a stir in the world of the reader's feelings whereas that of the statesmen i.e., Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman (1920-1975) is to work for the welfare of the people in the public interest. In this case, both the writers as well as politicians have to witness the time and society in the implementation of their ends. From that point of view, it can be seen that both Rabindranath and Sheikh Mujib observed the development activities of Russia and China consecutively that had aroused a worldwide response in the past. The nature of this progress had been illustrated by Rabindranath in his Russiar Chithi, or Letters from Russia (1931) and Bangabandhu in his book Amar Dekha Noya Chin (2020). Though the two books have a distance of more than twenty years of its publication are mainly based on Rabindranath's visit to Russia and that of Bangabandhu to China. It is evident that the time and space of the two books are different but the subjects described are basically the same. In his letters, Rabindranath examined the progress of the new socialist state system in Russia through the October or Bolshevik Revolution of 1917 which marked a radical change in the way of life of the Soviets. On the other hand, Bangabandhu in his travelogue also embodies the initial progress of the New China after the Chinese Revolution in 1949. As a result, both Rabindranath and Sheikh Mujib were active in reviewing the nature of post-revolutionary Russia and China respectively which are identical in subject matter. Due to the depth of their vision, the main purpose of this article is to depict the nature of the ways in which the

two countries sought to radically change themselves in a short period of time after the revolution.

সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে সময়ের প্রবহমানতায় যুগ যুগ ধরে দাসত্বের শৃঙ্খলে জর্জরিত অধিকার বঞ্চিত ও নিপীড়িত গণমানুষের শোষণের ফলে তাদের 'পুঞ্জীভূত সংক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ' হিসেবে দেশে দেশে সংগঠিত হয়েছে বিভিন্ন বিপ্লব। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় বিপ্লব হলো- a revolution is a fundamental and relatively sudden change in political power and political organization which occurs when the population revolts against the government, typically due to perceived oppression or political incompetence. (Allan Bullock and Stephen Trombley 1999: 745-46) অর্থাৎ শোষণ, নিপীড়ন অথবা রাজনৈতিক অযোগ্যতার কারণে যখন জনগণ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও রাজনৈতিক সংগঠনে অপরিহার্য এবং অপেক্ষাকৃতভাবে আকস্মিক পরিবর্তন ঘটায় তখন তাকে বিপ্লব বলা হয়। বিপ্লবের প্রভাবে যে জাগরণ সূচিত হয় তা সঙ্গত কারণেই বিপ্লব সংগঠিত ভৌগলিক পরিমণ্ডলে সীমাবদ্ধ থাকে না বিধায় মানব ইতিহাসে বিপ্লবের ভূমিকা অনস্বীকার্য। মানব ইতিহাসে বহু বিপ্লব সংগঠিত হলেও দুটি উল্লেখযোগ্য বিপ্লব হলো ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সংগঠিত অক্টোবর বিপ্লব ও ১৯৪৯ সালে চীনে সংগঠিত চীনা বিপ্লব। সোভিয়েত রাশিয়ায় শত শত বছরের জার শাসনামলের পতনের মধ্য দিয়ে বিপ্লব পরবর্তী সময়ে সোভিয়েত রাশিয়ায় মাত্র তের বছরের ব্যবধানে যে আমূল পরিবর্তন সংগঠিত হয়েছে সেই পরিবর্তন ও অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাবে চীনে সংঘটিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে যে নবজাগরণ সূচিত হয়েছিল তা যথাক্রমে বাংলা সাহিত্যের পুরোধা ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পত্রসাহিত্য *রাশিয়ার চিঠি*তে ও বাঙালি জাতির কিংবদন্তী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর রচিত ভ্রমণসাহিত্য *আমার দেখা নয়াচীন* গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। মূলত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও অর্থনীতিসহ সার্বিকক্ষেত্রে সোভিয়েত রাশিয়া ও সমাজতান্ত্রিক চীনের আমূল পরিবর্তনের গতি-প্রকৃতি বর্ণিত হয়েছে গ্রন্থ দুটিতে। সাহিত্যের শ্রেণি বিচারে রবীন্দ্রনাথের *রাশিয়ার চিঠি* ভ্রমণ সাহিত্য ও পত্র সাহিত্য উভয়ই তবে *আমার দেখা নয়াচীন* একটি ভ্রমণ সাহিত্য হিসাবে পরিগণিত। *রাশিয়ার চিঠি*তে চৌদ্দটি পত্র ও পরিশিষ্ট অংশে তিনটি প্রবন্ধ রয়েছে। এ পত্রগুলো ভ্রমণকালে লেখক তাঁর সুহৃদ আটজন ব্যক্তিকে পাঠিয়েছিলেন। অপরদিকে, বঙ্গবন্ধু *আমার দেখা নয়াচীন* গ্রন্থে কোন পর্ব বিভাজন না করে কালানুক্রমে চীনের অগ্রগতির প্রাথমিক যাত্রাকে কতকগুলো মানদন্ডের আলোকে স্বল্প পরিসরে আলোকপাত করেছেন।

বিশ্ব ইতিহাসের পটভূমিতে পুঁজিবাদী বুর্জোয়া শ্রেণির নের্তৃত্বে জার শাসনের শোচনীয় পতন ও পরবর্তীতে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে রাশিয়ায় শ্রমিক অস্থিরতা ও কৃষক অসন্তোষ চূড়ান্ত রূপ ধারন করলে এরই ধারাবাহিকতায় ১৯১৭ সালে সংঘঠিত হয় অক্টোবর বিপ্লব। এ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক শাসনের যে ধারা সূচিত হয়েছিল এ শাসনব্যবস্থার নয় বছরের মাথায় প্রথম ১৯২৬ সালে ও পরবর্তীতে ১৯২৯ সালে দ্বিতীয় বার রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েত রাশিয়ায় আমন্ত্রিত হলেও ভগ্নস্বাস্থ্যের দূর্ভোগ

হেতু পর পর দুবারই তিনি আমন্ত্রণ রক্ষা করতে অসমর্থ হন। তবে পরবর্তীতে সোভিয়েত রাশিয়ার অভূতপূর্ব অগ্রগতি শ্রবণপূর্বক চর্মচক্ষে তা দর্শনের নিমিত্তে ১৯৩০ সালে মস্কৌর আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া গমনে উদ্যোগী হলে ''... কবির বন্ধুবান্ধবরা তাঁহার খারাপ শরীরের অজুহাতে তাঁহাকে রুশ যাত্রা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টায় ছিলেন।''(প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়: ১৯৭০) তবে রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এ বাধার মূল কারণ সম্পর্কে অবগত করেন।[১]

শেষাবধি দৃঢ় সংকল্পের দ্বারা সকল বাধাকে অবলীলায় উপেক্ষা করে রাশিয়ায় উপনীত হন রবীন্দ্রনাথ। যদিও সোভিয়েত রাশিয়া ভ্রমণের প্রায় এক যুগ পূর্বে বিপ্লবের কিছুকালের মধ্যে অর্থাৎ ১৯১৮ সালে সোভিয়েত রাশিয়ার আদর্শ এবং তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে সংশয় ব্যক্ত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এভাবে:

> We have heard that Modern Russia is floundering in its bottomless abyss of idealism... We... know very little of the history of the present revolution in Russia, and with the scanty materials in our hands... all that we can say is that the time to judge has not yet come... It is not unlikely that, as a nation, she will fail; but if she fails with the flag of true ideals in her hands, her failure will fade, like the morning star, only to usher in the sunrise of the New Age. (Modern Review 1918: 1-4)

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, আবাসন ব্যবস্থাসহ সার্বিকক্ষেত্রে ভারতের শতবর্ষের দৈন্যদশার সাথে রাশিয়ার যে সাদৃশ্য ছিল স্বল্প সময়ের ব্যবধানে সোভিয়েত সরকারের সময়োপযোগী কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে তার যে অভাবনীয় পরিবর্তন চক্ষুগোচর হয় তা রবীন্দ্রনাথকে বিস্মিত করেছিল, এমনকি পরবর্তীতে সোভিয়েত রাশিয়া ভ্রমণের পূর্বে তাঁর যে সংশয় ছিল তাও কেটে গিয়েছিল এবং ভারতবর্ষের শোচনীয় অবস্থা পুনরানুধাবনে সচেষ্ট করেছিল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়- ''কয়েক বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের অবস্থার সঙ্গে এদের জনসাধারণের অবস্থার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য ছিল– এই অল্পকালের মধ্যে দ্রুতবেগে বদলে গেছে-আমরা পড়ে আছি জনতার পাঁকের মধ্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন।''(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০১২: ৬) এই দ্রুতবেগে বদলে যাওয়ার ক্ষেত্রে গৃহীত পন্থাগুলোকে সুচিহ্নিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। অপরদিকে বাঙালি জাতির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জনে নের্তৃত্ব দানকারী পুরোধা ব্যক্তিত্ব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঔপনিবেশিক শাসনে জর্জরিত

[১] জনৈক মার্কিন সাংবাদিক পরিবেশিত একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের মাধ্যমে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানান যে: ''Tagore revealed while resting in Geneva, that he is…heart and soul for the indian nationalists' movement. It is understood – it is because of impetus which his presence might give to pro-Gandhi sentiment in the USA ana Russia that the coterie of Englishmen who surrounded him here was continuously against his trips for reasons of health.''(New York World, 5 September)

ভারতবর্ষের প্রায় দ্বিশতবর্ষের পরাধীনতার গ্লানি মোচনের অনতিবিলম্বে পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক শাসন ও শোষণের ফলশ্রুতিতে ক্রমান্বয়ে বিপর্যস্ত পূর্ব বাংলার জনসাধারনের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাকে বিপ্লবোত্তর নয়াচীনের গৃহীত সামগ্রিক পদক্ষেপের আলোকে অনুধাবন করার চেষ্টা করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩০ সালে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় যেমন আমন্ত্রিত হয়ে গমন করেন তেমনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও চীনের পিকিং এ অনুষ্ঠিত এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক শান্তি সম্মেলনের আমন্ত্রণে পাকিস্তান শান্তি কমিটির পক্ষে চীনে ১৯৫২ সালে গমন করেন। যাত্রাকালে রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ সঙ্গী হিসেবে ছিলেন আমেরিকান চিকিৎসক হ্যারি টিম্বার্স, অ্যালবার্ট আইনস্টাইন কন্যা কুমারী মার্গারেট আইনস্টাইন, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আরিয়াম উইলিয়ামস্ ও অমিয় চক্রবর্তী আর বঙ্গবন্ধুর ভ্রমণসঙ্গী ছিলেন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব পূর্ববাংলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব আতাউর রহমান খান, ইত্তেফাক সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন, বন্ধুবর খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস ও ইউসুফ হাসান।

বিপ্লবের পূর্বে সোভিয়েত রাশিয়া ও চীনের অবস্থা কেমন ছিল সে সম্পর্কে ধারণা থাকলে বিপ্লব পরবর্তী সময়ে সোভিয়েত রাশিয়ার ও চীনের রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনে কি ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল তার রূপরেখা অনুধাবন করা সহজ হবে। বিপ্লব পূর্ব সময়ে শিক্ষা, কৃষি, ধর্মসহ সার্বিক ক্ষেত্রে রাশিয়ার অবস্থা নিরূপণ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *রাশিয়ার চিঠি*র ৪ নং চিঠিতে জানান:

> বছর-দশেক আগেই এরা ঠিক আমাদেরই দেশের জনমজুরদের মতই নিরক্ষর নিঃসহায় নিরন্ন ছিল, তাদেরই মত অন্ধ সংস্কার এবং মূর্খ ধার্মিকতা। দুঃখে বিপদে এরা দেবতার দ্বারে মাথা খুটেছে; পরলোকের ভয় পান্ডাপুরুষদের হাতে এদের বুদ্ধি ছিল বাঁধা, আর ইহলোকের ভয় রাজপুরুষ মহাজন ও জমিদারের হাতে; যারা এদের জুতোপেটা করতো তাদের সেই জুতো সাফ করা এদের কাজ ছিল। হাজার বছর থেকে এদের প্রথা পদ্ধতির বদল হয় নি, যানবাহন চরকা-ধানি সমস্ত প্রপিতামহের আমলের, হালের হাতিয়ারে হাত লাগাতে বললে বেঁকে বসত। আমাদের দেশের ত্রিশ কোটির পিঠের উপরে যেমন চেপে বসেছে ভূতকালের ভূত, চেপে ধরেছে তাদের দুই চোখ-এদেরও ঠিক তেমনি ছিল। (২০১২: ১৬)

অথচ স্বল্প সময়ের ব্যবধানে অর্থাৎ বিপ্লবের মাত্র ১৩ বছরের মধ্যেই সোভিয়েত রাশিয়া তাদের রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনে আমূল পরিবর্তন সূচিত করেছে। এ সময় সোভিয়েত সরকার কর্তৃক গৃহীত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সোভিয়েতবাসীর দৃঢ় সংকল্প ও সম্মিলিত প্রচেষ্টা সোভিয়েতবাসীকে দুর্বার গতিতে এগিয়ে নেয়। রাশিয়ার নানামুখী কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টিগোচর হয় এবং তিনি সোভিয়েত সরকারের নানামুখী পদক্ষেপকে *রাশিয়ার চিঠি*তে তুলে ধরেন। তবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৪৯ সালে সংগঠিত চীনা বিপ্লবের মাত্র তিন বছর পর অর্থাৎ ১৯৫২ সালে নয়াচীন ভ্রমণ করেন। এ স্বল্প সময়ে নয়াচীনের সার্বিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন দৃশ্যমান না হলেও সূচিত হয়েছিল। ফলে শাসক চিয়াং কাইশেকের শোষণ থেকে সদ্য মুক্তি লাভ করা একটি দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন ও অগ্রগতি সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী প্রকাশ করেছেন বঙ্গবন্ধু *আমার দেখা নয়াচীন*গ্রন্থে।

বিপ্লবোত্তর সময়ে সোভিয়েত ও নয়াচীন সরকার যে সকল ক্ষেত্রে পুনর্গঠন কর্মসূচির মাধ্যমে সমগ্র রাশিয়া ও চীনে আমূল পরিবর্তন সূচিত করেছিল সেসকল ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে বেশ কিছু বিষয়গত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। সাদৃশ্যমূলক ক্ষেত্রগুলো হলো:

- শিক্ষা খাত
- কৃষি খাত
- শিশু পরিচর্যা
- শ্রমিকদের জীবন মানোন্নয়ন
- স্বাস্থ্য খাত
- লিঙ্গভেদে সমতায়ন ও ক্ষমতায়ন
- ধর্মীয় স্বাধীনতা
- জাতীয়তাবাদ ও দেশাত্মবোধ
- পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা

উপর্যুক্ত ক্ষেত্রগুলো পর্যায়ক্রমে আলোচনার মাধ্যমে বিপ্লব পরবর্তী সময়ে সোভিয়েত ও নয়াচীনের নবজাগরণের স্বরূপ পর্যালোচনা করা হয়েছে। সোভিয়েত ও নয়াচীন সরকার বিপ্লব পরবর্তী সময়ে যে ক্ষেত্রটির উপর সর্বপ্রথম সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছেন তা হলো শিক্ষা। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড একথা সর্বজন বিদিত হলেও শিক্ষা গ্রহণ ও বিস্তারে যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী পশ্চাৎপদ হয়ে রয়েছে। ফলে তাদের উন্নয়ন ও অগ্রগতি সর্বত্রই ব্যাহত হয়েছে। কারণ অশিক্ষিত ব্যক্তি অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হাওয়ায় তাদের বোধের জগৎ বন্ধ্যাত্ব লাভ করে। ফলশ্রুতিতে দাসত্বের শৃংখলকে তারা নিয়তি নির্ধারিত অমোঘ বিধান বলে অনুধাবন করে, ক্ষুৎপিপাসা নিবারণকে জীবনের প্রধান অন্বিষ্ট বলে বিবেচনা করে। এমনকি নিজেদের কার্যক্ষমতা সম্পর্কে সন্দিহান সংখ্যাগরিষ্ঠ এই অশিক্ষিত শ্রেণি রাষ্ট্রের বৃহৎ অগ্রযাত্রায়ও থাকে অনুপস্থিত। ফলে যুগ যুগ ধরে সকল দেশে ও সমাজে অশিক্ষিত এই শ্রেণি নিজেদের প্রাপ্য অধিকার থেকে যেমন বঞ্চিত হয়েছে তেমনি তাদের পশ্চাৎপদতার দরুণ সমাজ ও রাষ্ট্রের সার্বিক অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে। এ অধিকার বঞ্চনা থেকে পরিত্রাণের ও সর্বোপরি রাষ্ট্রের উন্নয়নের একমাত্র পথ হল সমাজের

সর্বস্তরের জনগণকে শিক্ষার পাদপ্রদীপের আলোয় আলোকিত করা। যে সকল রাষ্ট্র, সমাজ ও জাতির সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সকল শ্রেণির জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবনে সচেষ্ট হয়েছে, তারাই নিজেদের আমূল পরিবর্তন ত্বরান্বিত করে পশ্চাৎপদতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে উন্নয়নের সর্বোচ্চ শিখরে স্থান করে নিয়েছে। অক্টোবর বিপ্লবের পর সোভিয়েত সরকারের ও চীনা বিপ্লবের পর নয়াচীন সরকারের শিক্ষা খাতে গৃহীত পদক্ষেপ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সোভিয়েত সরকার শত বছরের জীর্ণতা থেকে মুক্তিকল্পে পুনর্গঠনে নিয়োজিত হয়ে সকল পশ্চাৎপদতার মূলে যে অশিক্ষা তা দূরীকরণে জনগণকে কর্মমূখী ও স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে 'বন্যার মত বেগে' শিক্ষার অবাধ বিস্তারে কর্মতৎপরতা দেখিয়েছে। এ কর্মতৎপরতার নিদর্শনস্বরূপ শিক্ষা বিতরণ ও বিস্তারে সোভিয়েত সরকারের গৃহীত নানামুখী উদ্যোগগুলো হলো:

- বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শিক্ষা বিতরণের জন্য উপযোগী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠাকরণ
- শিক্ষা বিস্তারে বিপুল অঙ্কের বাজেট বরাদ্দকরণ
- শিক্ষাকে সহজকীকরনের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রদেশে রোমক বর্ণমালার প্রচলন
- পুঁথিগত বিদ্যাকে ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে ভ্রমণ বিদ্যালয় স্থাপন

শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে গৃহীত উপর্যুক্ত উদ্যোগসমূহ স্বল্প সময়ে বাস্তবায়নের ফলে সোভিয়েত জনগোষ্ঠীর চিত্তের যে সুগভীর জাগরণ সূচিত হয়েছে তার স্বরূপ বিধৃত করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৬ নং চিঠিতে:

> রাশিয়ায় গিয়েছিলুম ওদের শিক্ষাবিধি দেখবার জন্য। দেখে খুবই বিস্মিত হয়েছি। আট বৎসরের মধ্যে শিক্ষার জোরে সমস্ত দেশের লোকের মনের চেহারা বদলে দিয়েছে। যারা মূক ছিল তারা ভাষা পেয়েছে, যারা মূঢ় ছিল তাদের চিত্তের আবরণ উদঘাটিত, যারা অক্ষম ছিল তাদের আত্মশক্তি জাগরুক, যারা অবমাননার তলায় তলিয়ে ছিল আজ তারা সমাজের অন্ধকুঠুরি থেকে বেরিয়ে এসে সবার সঙ্গে সবার আসন পাবার অধিকারী। (২০১২: ২২)

শিক্ষাখাতে সোভিয়েত সরকারের গৃহীত যাবতীয় কর্মপন্থার দরুণ সোভিয়েতবাসী নিজেদের উন্নয়নে তৎপর হয়েছে। অক্টোবর বিপ্লবের দ্বারা উদ্বোধিত হয়ে চীনে গঠিত সমাজতান্ত্রিক কমিউনিস্ট দলের মাধ্যমে চীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পরবর্তীতে নয়াচীন সরকার চীনা জনসাধারণের উন্নয়নকল্পে সর্বস্তরে শিক্ষা প্রচারে ও প্রসারে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে নয়াচীন সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো হলো:

- পুঁথিগত বিদ্যা অপেক্ষা জীবনমুখী ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদানে নয়াচীন সরকার কর্তৃক কৃষি, শিক্ষা, শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনিক্যাল শিক্ষাব্যবস্থা চালুকরণ
- শিক্ষাকে জনগণের দোরগোঁড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালুকরণ
- নয়াচীন সরকার কর্তৃক শিক্ষার্থীদের যাবতীয় খরচ বহন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ নিশ্চিতকরন
- বয়সভেদে শিক্ষাদান প্রণালীর মধ্যে ভিন্নতা অবলম্বন এবং বড়দের কাজের ফাঁকে ও ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্য আলাদা ব্যবস্থাকরণ সোভিয়েত সরকার শিক্ষার ব্যাপক উন্নয়ন ঘটানোর পাশাপাশি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে কৃষি খাতে উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মতৎপর হয়েছে। কারণ জার শাসনামলে রাজতন্ত্রের প্রভাবে কৃষি নির্ভর অর্থনীতি থাকলেও ফরাসি বিপ্লবের পর নতুন পুঁজিবাদী সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে ওঠায় শিল্পনির্ভর অর্থনীতি গড়ে ওঠে। ফলে এ সময় শিল্প খাত প্রাধান্য পেলেও কৃষি খাত অবহেলিত হওয়ার কারণে এ খাতে ব্যাপক বিপর্যয় পরিলক্ষিত হয়। পূর্বের প্রাচীন কৃষি পদ্ধতি ও কৃষি খাত অপেক্ষা শিল্পখাতে গুরুত্বারোপ করায় এ সময় কৃষি ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছিল। কৃষকদের দূরবস্থার চিত্র নিরূপণে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা হায়দার আকবর খান রনো'র 'ফরাসি বিপ্লব থেকে অক্টোবর বিপ্লব' গ্রন্থের অভিমত বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য:

  রাশিয়ায় একদিকে জমিদারতন্ত্র ছিল, যদিও ঊনবিংশ শতাব্দীতে পুরনো ভূমিদাস প্রথা উঠে গিয়েছিল, অপরদিকে কৃষিতে পুঁজিবাদের অনুপ্রবেশ ঘটে ছিল দ্রুত গতিতে। একদিকে সামন্ত অর্থনীতি, অপরদিকে পুঁজিবাদী অর্থনীতি। মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে খুদে কৃষক। (হায়দার আকবর খান রনো ২০১৪: ২১১)

যেহেতু স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌহার্দ্যের স্লোগানকে ধারণ করে সংঘটিত হয়েছিল বলশেভিক বিপ্লব সেহেতু এ বিপ্লবের পর সোভিয়েত সরকার সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নকল্পে সুপরিকল্পিত পন্থা অবলম্বন করেছিল। ফলশ্রুতিতে এ 'খুদে কৃষকের' উন্নয়ন ও কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে সোভিয়েত সরকার নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কৃষিক্ষেত্রে সোভিয়েত সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো হলো:

- প্রাচীন কৃষি পদ্ধতির পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের ব্যবস্থাকরণ
- কৃষি সম্বন্ধে কৃষকদের শেখানোর জন্য কৃষি ভবন নির্মাণ
- বিশেষ ক্লাসের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে চাষবাদের পদ্ধতি সম্বন্ধে কৃষকদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থাকরণ
- চাষীদের সকল প্রকার প্রয়োজনের উপযোগী পরামর্শদানের ব্যবস্থাকরণ

- ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে বিজ্ঞানসম্মত সার ও কলের লাঙ্গলের সহজ ও নির্বিঘ্ন ব্যবহার নিশ্চিতকরণ
- ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুতকরণ
- কৃষকদের জন্য নির্ধারিত শ্রমঘণ্টা ব্যতিরেকে অতিরিক্ত কাজের জন্য উপরি পারিশ্রমিক প্রদানের ব্যবস্থাকরণ
- ফসল উৎপাদনের মৌসুম ব্যতীত অর্থাৎ শীতের সময় কাজ কমে গেলে কৃষকদের স্বেচ্ছায় বিকল্প কাজে (যেমন- বাড়ি তৈরি, রাস্তা মেরামত) যোগদানের ব্যবস্থাকরণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সোভিয়েত রাশিয়ার কৃষি ব্যবস্থার যে সার্বিক অগ্রগতি অবলোকন করেছেন তা নিরূপণ করেছেন *রাশিয়ার চিঠি* গ্রন্থভুক্ত চিঠিগুলোতে। ৫ নং চিঠিতে চাষীদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে নতুন কৃষি পদ্ধতি হিসেবে ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুতকরণ, কৃষি ব্যবস্থা সম্বন্ধে শিক্ষাদানের জন্য কৃষিভবন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ ও উন্নত জাতের বীজ প্রস্তুতকরণ, বাছাইকরণ ও দেশের সর্বত্র তার ব্যবহার নিশ্চিতকরণে সোভিয়েত সরকারের নানামুখী পদক্ষেপ এ চিঠিতে উল্লেখ করেছেন। সেই সাথে চাষাবাদের সীমাবদ্ধতাকে চিহ্নিত করে ঐকত্রিক কৃষি ক্ষেত্রের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করেছেন মধ্য এশিয়ার বাস্‌কির রিপাবলিকের একজন চাষীর মাধ্যমে:

> স্বাতন্ত্র্যপ্রণালীর চেয়ে ঐকত্রিক প্রণালীতে ঢের ভাল জাতের এবং অধিক পরিমাণে ফসল উৎপন্ন করানো যায়। যেহেতু, প্রকৃষ্টভাবে চাষ করতে গেলেই যন্ত্র চাই; ছোট ক্ষেতের মালিক এর পক্ষে যন্ত্র কেনা চলে না। তা ছাড়া আমাদের টুকরো জমিতে যন্ত্রের ব্যবহার অসম্ভব। (২০১২: ২০)

তাই শুধু প্রাচীন কৃষি ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতাকে নির্দিষ্ট করেনি সোভিয়েত সরকার, সেই সাথে সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে কৃষকের উন্নয়নকল্পে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ভ্রমণকারীর ভাষায়:

> মস্কোতে একটি কৃষি ভবন দেখতে গিয়েছিলুম।...এসব জায়গায় কৃষিবিদ্যা সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে উপদেশ দেবার ব্যবস্থা আছে; যারা নিরক্ষর তাদের পড়াশুনো শেখানোর উপায় করেছে; এখানে বিশেষ বিশেষ ক্লাসে বৈজ্ঞানিক রীতিতে চাষ করার ব্যবস্থা কৃষাণদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এইরকম প্রত্যেক বাড়িতে প্রাকৃতিক সামাজিক সকল প্রকার শিক্ষণীয় বিষয়ের মিউজিয়াম, তা ছাড়া চাষীদের সকল প্রকার প্রয়োজনের উপযোগী পরামর্শ দেবার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। (২০১২: ১৭)

নতুন শস্যের প্রচলন, বীজ বাছাইকরণ ও উৎপাদনে সোভিয়েত সরকার ব্যাপক ভূমিকা পালন করে সমগ্র বিশ্বে বৈজ্ঞানিক মহলে ভূয়সী প্রশংসা কুড়িয়েছে। এই প্রশংসার কারণ নিরূপণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫ নং পত্রে:

> এই দশ বছরের মধ্যে এদের কৃষি চর্চা বিভাগের যে উন্নতি ঘটেছে তার খ্যাতি ছড়িয়ে গেছে জগতের বৈজ্ঞানিক-মহলে। যুদ্ধের পূর্বে এ দেশে বীজ–বাছাইয়ের কোন চেষ্টাই ছিল না। আজ প্রায় তিন কোটি মণ–বাছাই করা বীজ এদের হাতে জমেছে। তাছাড়া নূতন শস্যের প্রচলন শুধু এদের কৃষি–কলেজের প্রাঙ্গণে নয়, দ্রুতবেগে সমস্ত দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। কৃষি সম্বন্ধে বড় বড় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাশালা আজারবাইজান, উজবেকিস্তান, জর্জিয়া, য়ুক্রেন প্রভৃতি রাশিয়ার প্রত্যন্ত–প্রদেশে স্থাপিত হয়েছে। (২০১২: ২২)

কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নকল্পে সোভিয়েত সরকারের অগ্রগামী ভূমিকা যেমন লক্ষণীয় তদ্রূপভাবে দেখা যায় যে, নয়াচীন সরকার কৃষি ব্যবস্থা উন্নয়নকল্পে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণে তৎপর হয়েছে। নয়াচীন সরকার কৃষির জন্য বিভিন্ন প্রদেশগুলোতে বিরাট ফার্ম প্রস্তুত করেছে। পাশাপাশি উন্নত বীজ প্রস্তুত করে তা দেশের সর্বত্র চাষাবাদের জন্য প্রেরণ করে ফার্ম পরিচালনায় দক্ষ জনবল নিয়োগ দিয়েছে। বঙ্গবন্ধু নয়াচীনের কৃষিব্যবস্থার চিত্র নিরূপণ করেছেন:

> চীন সরকার কৃষির উন্নতি করছে-মাথাভারী ব্যবস্থার ভিতর দিয়া নয়, সাধারণ কর্মীদের দিয়া। বিরাট ফার্ম, সেখানে বীজ তৈয়ার করা হয় এবং দেশের ভিতর সেই ভালো বীজ ব্যবহার করার জন্য পাঠানো হয়। কৃষি শ্রমিকদের সুবিধাও অনেক। (শেখ মুজিবুর রহমান ২০২০: ৬৬)

শিশুরাই দেশ ও জাতি গড়ার ভবিষ্যৎ কারিগর। সামাজিক স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতির ভিত্তিতে সমাজে শিশুদেরকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথমত সামাজিকভাবে স্বীকৃত বা বৈধ শিশু সন্তান, দ্বিতীয়ত অবৈধ বা জারজ শিশু সন্তান। তবে একটি বিষয় অবশ্যই লক্ষণীয় যে, এ দু' শ্রেণীর শিশুরা সমাজে একইভাবে গৃহীত ও সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয় না। ধর্মীয় বন্ধনে আবদ্ধ দম্পতির সন্তানেরা পারিবারিক এবং সামাজিকভাবে যেমন স্বীকৃতি লাভ করে তেমনি সর্বত্রই সুযোগ সুবিধা লাভ করে। পক্ষান্তরে, অভিভাবকহীন জারজ সন্তানেরা পারিবারিক ও সামাজিক উভয় ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে বঞ্চিত ও নিগৃহীত। সমাজে এ শ্রেণীর শিশুদের সংখ্যাধিক্য না থাকলেও এদের সংখ্যা নেহাত কম নয়। পিতৃ-মাতৃহীন এসকল অনাথ ও জারজ শিশুরা রাষ্ট্রেরই একটি অংশ। তবে পরিপূর্ণ পরিচর্যার অভাবে এ শিশুদের বিপথগামীতায় স্বভাবতই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই সোভিয়েত সরকার এ শ্রেণির শিশুদের গুরুত্ব অনুধাবন করেছে। যা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিগোচর হয়েছে :

> তাদের ভাবখানা এই, সন্তানেরা কেবল তো বাপ-মায়ের নয়, মুখ্যত সমস্ত সমাজের। তাদের ভালোমন্দ নিয়ে সমস্ত সমাজের ভালোমন্দ। এরা যাতে মানুষ হয়ে ওঠে তার দায়িত্ব সমাজের, কেননা তার ফল সমাজেরই। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০১২: ৪৬)

তাই দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে সামাজিকভাবে স্বীকৃত শিশু ও জারজ শিশু এ দুয়ের মধ্যে কোন বিভাজন করেনি সোভিয়েত ও নয়াচীন সরকার। সন্তান জারজ বা বিবাহিত দম্পতির যাই হোক না কেন উভয়কে ভবিষ্যৎ উন্নয়নের সৈনিক হিসেবে বিবেচনা করে তাদের পরিচর্যায় অভিন্ন বিধানের ব্যবস্থা করেছে উভয় সরকার। সোভিয়েত সরকার এ সকল শিশুদের জন্য গড়ে তুলেছে 'পায়োনিয়র্স্ কম্যুন'[২]। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *রাশিয়ার চিঠি*র ১৩ নং চিঠিতে শিশুদের সম্বন্ধে সোভিয়েত সরকারের বিধান নিরূপণ করেছেন:

> শিশু জারজ কিংবা বিবাহিত দম্পতির সন্তান সে সম্বন্ধে কোন পার্থক্য এরা গণ্যই করে না। আইন এই যে, শিশু যে পর্যন্ত না ১৮ বছর বয়সের সাবালক হয় সে পর্যন্ত তাদের পালনের ভার বাপ-মায়ের। বাড়িতে তাদের কিভাবে পালন করা বা শিক্ষা দেওয়া হয় স্টেট সে সম্বন্ধে উদাসীন নয়। ১৬ বছর বয়সের পূর্বে সন্তানকে কোথাও খাটুনির কাজে নিযুক্ত করতে পারবে না। আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত তাদের কাজের সময় পরিমাণ ৬ ঘন্টা। ছেলেদের প্রতি পিতামাতা আপন কর্তব্য করছে কি না তার তদারকের ভার অভিভাবক-বিভাগের 'পরে। এই বিভাগের কর্মচারী মাঝে মাঝে পরিদর্শন করতে আসে, দেখে ছেলেদের স্বাস্থ্য কিরকম আছে, পড়াশুনো কি রকম চলছে। যদি দেখা যায় ছেলেদের প্রতি অযত্ন হচ্ছে, তাহলে বাপ-মায়ের হাত থেকে ছেলেদের ছাড়িয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু তবুও ছেলেদের ভরণপোষণের দায়িত্ব থাকে বাপ-মায়েরই। এই রকম ছেলেমেয়েদের মানুষ করবার ভার পড়ে সরকারি অভিভাবক-বিভাগের উপর। (২০১২: ৪৬)

নয়াচীন সরকারও যে এ সকল জারজ সন্তানদের প্রতি সহানুভূতিশীল দৃষ্টি প্রদান করেছে তা বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। যেমন:

> তবে একটা অদ্ভুত নতুন প্রথা করা হয়েছে নয়াচীনে, সেটা হলো অবিবাহিত মেয়েদের ছেলে মেয়ে হলে সরকার সেই ছেলে মেয়েদের রাষ্ট্রের ছেলে মেয়ে হিসেবে গ্রহণ করে। অন্যপক্ষে,

---

[২] পায়োনিয়র্স্ কম্যুন এ বসবাসকারীদের পরিচয় ও বর্তমান অবস্থা নিরূপণ করে রবীন্দ্রনাথ বলেন: 'এরা সকলেই পিতৃমাতৃহীন। এরা যে শ্রেণী থেকে এসেছে একদা সে শ্রেণীর মানুষ কারো কাছে কোনো যত্নের দাবী করতে পারত না।...এদের মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম ...সংকোচ নেই, জড়তা নেই।' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০১২: ২৪)

যদি কেউ তাদের হিংসা বা ঘৃণা করে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা আছে। (শেখ মুজিবুর রহমান ২০২০: ১০০)

তাই সকল শ্রেণীর শিশুদের নয়াচীন সরকার 'প্রিভিলেজড ক্লাস' হিসেবে গণ্য করে তাদের জন্য বিভিন্ন সুবিধাদি প্রদানে বাধ্যতামূলকভাবে নিয়ম করেছে। শিশুদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে স্কুলে প্রেরণ করা থেকে শুরু করে সুস্থ জনসম্পদ গঠনের লক্ষ্যে বয়স উপযোগী খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ করেছে। এবং তাদের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে খেলাধুলা ও বিনোদনের ব্যবস্থা করেছে। এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধুর পর্যবেক্ষণ হলো:

এক এক দেশে এক এক প্রকারের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট শ্রেণি' (প্রিভিলেজড ক্লাস) আছে- যেমন আমাদের দেশে অর্থশালী জমিদাররা 'প্রিভিলেজড ক্লাস', অন্য দেশে শিল্পপতিরা 'প্রিভিলেজড ক্লাস'; কিন্তু নতুন চীনে দেখলাম শিশুরাই 'প্রিভিলেজড ক্লাস'। এই প্রিভিলেজড ক্লাসটা সরকারের নানা সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে। নয়াচীন সরকারের হুকুম, প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে স্কুলে দিতে হবে, একটা পরিমাণ ঠিক করে দিয়েছে, সেই পরিমাণ খেতে দিতে হবে। পোশাক ঠিক করা আছে, সেইভাবে পোশাক দিতে হবে। যাদের দেবার ক্ষমতা নেই তাদের সরকারকে জানাতে হবে। সরকার তাদের সাহায্য করবে। (২০২০: ৬০)

শুধু দেশ গড়নের ভবিষ্যৎ সৈনিক হিসেবে বিবেচিত শিশুদের জন্যই নয়, বর্তমান সৈনিক হিসেবে ভূমিকা পালনকারী কৃষক, শ্রমিক ও সকল শ্রেণি পেশার উন্নয়নের জন্য ক্ষেত্রভেদে কর্মপন্থা নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সোভিয়েত রাশিয়া ও নয়াচীন সরকার। কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নকল্পে সোভিয়েত সরকার ও নয়াচীন সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে পূর্বেই আলোকপাত করা হয়েছে। শ্রমিকদের ক্ষেত্রে অবস্থার পরিবর্তনের লক্ষ্যে সোভিয়েত সরকার বাসস্থানের জন্য 'দ্য হোম অফ রেস্ট' নামে co-operative স্বাস্থ্যাগার ও শ্রমক্লান্ত শ্রমিকদের জন্য সানাটোরিয়ম বা আরোগ্যশালা নির্মাণ করেছে। শ্রমিকদের জন্য সোভিয়েত সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ তুলে ধরেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩ নং চিঠিতে:

সোভিয়েত রাষ্ট্রসঙ্ঘে একটি কো-অপারেটিভ সোসাইটি আছে, শ্রমিকদের জন্য বাসা নির্মাণ যার প্রধান কর্তব্য; সেই সোসাইটির নাম বিশ্রান্তিনিকেতন–The Home of Rest।...এমনতর আরো চারটি সানাটোরিয়ম এর হাতে আছে। খাটুনির ঋতুকাল শেষ হয়ে গেলে অন্তত ত্রিশ হাজার শ্রমক্লান্ত এই পাঁচটি আরোগ্যশালায় এসে বিশ্রাম করতে পারবে।

> প্রত্যেক লোক এক পক্ষকাল এখানে থাকতে পারে। আহারের ব্যবস্থা পর্যাপ্ত, আরামের ব্যবস্থা যথেষ্ট, ডাক্তারের ব্যবস্থাও আছে। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০১২: ৪৬)

অপরদিকে শ্রমিকদের জীবনমান সহজীকরণ ও উন্নয়নকল্পে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে নয়াচীন সরকার তা হলো:

- বিবাহিত ও অবিবাহিত উভয় শ্রমিকদের জন্য বাসস্থান সুবিধা
- নারী শ্রমিকের সন্তানদের দেখাশুনার জন্য মিলের পাশে নার্সিং হোম এর ব্যবস্থা
- নতুন বিবাহিত শ্রমিকদের কিছুদিনের জন্য অবকাশ যাপনের ব্যবস্থা
- শ্রমিকদের জন্য আলাদা হাসপাতালের ব্যবস্থা এবং অসুস্থ শ্রমিকদের জন্য বেতনসহ ছুটির ব্যবস্থা
- শ্রমিকদের জন্য শ্রান্তি বিনোদনের ব্যবস্থা
- প্রত্যেক শিল্প কেন্দ্রের পাশে শ্রমিকদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা

ফলে শাসক চিয়াং কাইশেকের সময়ে মালিকের স্বার্থ শতভাগ নিশ্চিতকরণের কারণে, শ্রমিকের স্বার্থ হরণের ফলে মালিক ও শ্রমিক উভয়ের মধ্যে যে তিক্ততা ছিল তা জাতীয় অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। তবে নয়াচীন সরকার শ্রমিক ও মালিক উভয়ের মধ্যে বিরাজমান প্রতিকূল সম্পর্ক সমঝোতার মাধ্যমে সমাধানকল্পে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে সচেষ্ট হয়। নয়াচীনে শ্রমিকের জন্য উপযুক্ত কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ ও তাদের কতিপয় মৌলিক চাহিদা পূরণে নয়াচীন সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ মালিক ও শ্রমিক উভয়ের স্বার্থ রক্ষায় অনস্বীকার্য ভূমিকা পালন করেছে। সাংহাইতে বঙ্গবন্ধু ও তার সফরসঙ্গীরা চীনের এক বড় কাপড়ের কল পরিদর্শনে গেলে শ্রমিক ও মালিক পক্ষ কর্তৃক আয়োজিত সভায় মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের বক্তব্যের মাধ্যমে উপর্যুক্ত বিষয়ের সত্যতা প্রতীয়মান হয়:

> আমরা শ্রমিক ও মালিক পাশাপাশি দেশের কাজ করছি। মিলটা শুধু মালিকের নয়, শ্রমিকের ও জনসাধারণেরও। আজ আর আমাদের মধ্যে কোন গোলমাল নেই। আমরা উভয়েই লভ্যাংশ ভাগ করে নেই। শ্রমিকের স্বার্থও আজ রক্ষা হয়েছে, মালিকের স্বার্থও রক্ষা হয়েছে। চিয়াং কাইশেক এর আমলে আমাদের মধ্যে তিক্ততা ছিল। মাঝে মাঝে মিল বন্ধ রাখা হত। আমাদেরও ক্ষতি হতো আর শ্রমিকদেরও ক্ষতি হতো। (শেখ মুজিবুর রহমান ২০২০: ৭০)

রাষ্ট্র পরিচালনার প্রধান চালিকাশক্তি হলো জনগণ। তাই রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচিত জনগণকে জনশক্তিতে পরিণত করাই হল রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য। তবে শারীরিকভাবে অসুস্থ

ও মানসিকভাবে অপ্রকৃতস্থ জনগণ যেহেতু উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে অক্ষম তাই জনগণের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার উপরও গুরুত্ব দিয়েছে সোভিয়েত ও নয়াচীন সরকার। সোভিয়েত সরকার জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিভিন্ন প্রদেশে স্বাস্থ্যনিবাস ও আরোগ্যালয় গড়ে তুলেছে। স্বাস্থ্যনিবাসগুলোতে খেটে খাওয়া মানুষদের জন্য যেমন বিনা ব্যয়ে থাকার সুবিধা রয়েছে তেমনি আরোগ্যালয়গুলোতে চিকিৎসার পাশাপাশি পথ্য ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে সোভিয়েত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব বিষয়ে সোভিয়েত রাশিয়ার যে বৈজ্ঞানিক অনুশীলন চলছে তা সমগ্র বিশ্বের প্রশংসা অর্জন করেছে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার ১০ নং চিঠিতে বলেন:

> স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে সোভিয়েট রাশিয়ায় যেরকম বৈজ্ঞানিক অনুশীলন চলছে তা দেখে য়ুরোপ-আমেরিকার পণ্ডিতেরা প্রচুর প্রশংসা করেছেন। শুধু মোটা বেতনের বিশেষজ্ঞদের দিয়ে পুঁথি সৃষ্টি করা নয়, সর্বজনের মধ্যে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রয়োগ যাতে পরিব্যাপ্ত হয়, এমন-কি, এদেশের চৌরঙ্গী থেকে যারা বহু দূরে থাকে তারাও যাতে অস্বাস্থ্যকর অবস্থার মধ্যে অযত্নে বা বিনা চিকিৎসায় মারা না যায়, সে দিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি আছে। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০১২: ৩৯)

নয়াচীন সরকারও জনগণের স্বাস্থ্যের সুস্থতা বিধানে রোগ নির্মূলে পূর্ববর্তী ও বর্তমান বছরের রোগীর হিসাব সংরক্ষণপূর্বক আসন্ন বছরের জন্য রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ ও সুচিকিৎসার জন্য উন্নত মানের যন্ত্রপাতি দ্বারা আধুনিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছে। বঙ্গবন্ধু হাসপাতাল পর্যবেক্ষণে গেলে জনৈক ব্যক্তি এ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন:

> রোগ অনেক কমে গিয়েছে। আমরা রোগ হওয়ার পরে চিকিৎসার চেয়ে রোগ যাতে না হয় তার দিকেই নজর বেশি দিয়েছি। প্রত্যেক বছরেই রোগীর হিসাব নিই। তাতে দেখা যায় আস্তে আস্তে, রোগ কমে আসছে। (শেখ মুজিবুর রহমান ২০২০: ৫৯)

লৈঙ্গিক বিভাজন নিরিখে ক্ষুদ্র পরিসরে পরিবার থেকে শুরু করে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও বিস্তৃত পরিসর হিসেবে পরিগণিত সমাজ ও রাষ্ট্রের সার্বিক কর্মকাণ্ডে পুরুষকে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হলেও যুগ যুগ ধরে নারী হয়েছে উপেক্ষিত। যার কারণে সমাজের একটি বৃহৎ অংশ জুড়ে বিদ্যমান নারী শক্তির অবমূল্যায়ন ও অপচয় অব্যাহত রয়েছে। তবে সোভিয়েত ও নয়াচীন সরকার রাষ্ট্রের ও জনগণের সার্বিক উন্নয়নকল্পে পুরুষের পাশাপাশি নারীর ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছে। ফলে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার প্রয়াসে সোভিয়েত সরকার উপযুক্ত কর্ম পরিবেশ হিসেবে ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের কর্মে নিয়োগ দিয়েছে। যা নারীদের ব্যক্তিক উন্নয়ন ও সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও তাদের চিত্তের উন্নতিকল্পে সোভিয়েত সরকার কর্তৃক গৃহীত ঐকত্রিক কৃষি ব্যবস্থার সুফল সাইবেরিয়ার স্বাবলম্বী একজন চাষী স্ত্রীলোকের ভাষ্যানুযায়ী:

> ঐকত্রিক কৃষি ক্ষেত্রের সঙ্গে নারী-উন্নতি-প্রচেষ্টার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। আজ দশ বছরের মধ্যে এখানে চাষী-মেয়েদের বদল হয়েছে যথেষ্ট। নিজের উপর তাদের অনেক বেশি ভরসা হয়েছে। যে-সব মেয়ে পিছিয়ে আছে, ঐকত্রিক চাষের যারা প্রধান বাধা, এরাই তাদের মন গড়ে তুলছে।...ঐকত্রিক দলের চাষী-মেয়েদের জীবনযাত্রা সহজ করে দেওয়ার জন্য প্রত্যেক ঐকত্রিক ক্ষেত্রে একটি করে শিশুপালনাবাস, শিশুবিদ্যালয় আর সাধারণ-পাকশালা স্থাপিত হয়েছে। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০১২: ১৯)

নারীর উন্নয়নকল্পে নয়াচীন সরকার পুরুষের পাশাপাশি নারীকেও কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট করেছে। উৎপাদনের সাথে কেবল পুরুষই নয় নারীকেও সংশ্লিষ্টকরণের লক্ষ্যে নয়াচীন সরকার পুরুষের পাশাপাশি নারীকেও সমপরিমাণ জমি বণ্টন করে দিয়েছে এবং উভয়ের জন্য জমিতে কাজ করার বিধি প্রচলন করেছে। নয়াচীন সরকার কেবল গৃহস্থ নারীদের উন্নয়নে কাজ করেনি, সেই সাথে সামাজিকভাবে নিগৃহীত পতিতা নারীদেরকে সম্মানজনক কাজের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছে। নারীর উন্নয়ন ঘটানোর পাশাপাশি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করা যার মূল লক্ষ্য। বঙ্গবন্ধু বলেন:

> জমি যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে তা পুরুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; স্বামী জমি যাহা পাবে, স্ত্রীও সমপরিমাণ জমি পাবে এবং দু'জনকেই পরিশ্রম করতে হবে। কারণ দুজনই জমির মালিক। স্বামী করবে আর স্ত্রী বসে খাবে এ প্রথা চীনের থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে। (শেখ মুজিবুর রহমান ২০২০: ৯০)

রাশিয়ার চিঠি এবং *আমার দেখা নয়াচীন* দুটি গ্রন্থে বিপ্লবোত্তর দুটি রাষ্ট্রের ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সহিষ্ণুতা অনেক বেশি প্রণিধানযোগ্য। বিপ্লব পূর্ববর্তী ধর্মীয় পরিস্থিতির স্বরূপ বিশ্লেষণ করে পরবর্তীতে রাষ্ট্র দুটি কিভাবে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা সরকারিভাবে নিশ্চিত করে তা পর্যালোচনা করা হয়েছে। *রাশিয়ার চিঠি* গ্রন্থের দ্বিতীয় চিঠিতে ভারতীয় উপমহাদেশে ধর্মীয় সহিংসতার বাস্তবতা চিত্রিত পূর্বক ইউরোপে তথা রাশিয়াতেও একদা ধর্মকে কেন্দ্র করে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যে সংঘাত বিদ্যমান ছিল তার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। কেবল শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে এ সংঘাতকে যে রাষ্ট্র ও সমাজ থেকে বিলোপ করা সম্ভব তাতেও রবীন্দ্রনাথের সুদৃঢ় ধারণা রয়েছে। শুধু ধর্মীয় সহিংসতা নয়, ধর্ম মূঢ়তাকে বাহন করে শাসক কিভাবে অপশাসন জারি রাখে ও মানুষের চিত্তের স্বাধীনতাকে বিনাশ করে তার বিবরণ দিয়েছেন লেখক ৭ নং চিঠিতে। লেখকের ভাষায়:

> যে রাজা প্রজাকে দাস করে রাখতে চেয়েছে সে রাজার সর্বপ্রধান সহায় সেই ধর্ম যা মানুষকে অন্ধ করে রাখে। সে ধর্ম বিষকন্যার মতো; আলিঙ্গন ক'রে সে মুগ্ধ করে, মুগ্ধ করে সে মারে। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০১২: ৩২)

বিপ্লবপূর্ব রাশিয়াতেও যে রাজা ধর্মকে ব্যবহার করে জনগণের উপর অপশাসন অব্যাহত রেখেছিল তাঁর বলিষ্ঠ উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন এভাবে "রাশিয়ার বুকের পরে ধর্ম ও অত্যাচারী রাজার পাথর চাপা ছিল; দেশের উপর থেকে সেই পাথর নড়ে যাওয়ায় কী প্রকাণ্ড নিষ্কৃতি হয়েছে।" (২০১২: ৩২) বিপ্লবোত্তর রাশিয়াতে ধর্মকে কেন্দ্র করে অত্যাচারী রাজার শাসনের ভীত নড়ে যাওয়ার পরে কিভাবে রাশিয়াতে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার ইঙ্গিত প্রদান করেন নিম্নরূপে- "যে পুরাতন ধর্মতন্ত্র এবং পুরাতন রাষ্ট্রতন্ত্র বহু শতাব্দী ধরে এদের বুদ্ধিকে অভিভূত এবং প্রাণশক্তিকে নিঃশেষ প্রায় করে দিয়েছে, এই সোভিয়েট বিপ্লবীরা তাদের দুটোকেই দিয়েছে নির্মূল করে।" (২০১২: ৩২) ফলে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির ক্ষেত্রে সোভিয়েত শাসনব্যবস্থার উদ্যোগের প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে মুগ্ধতা তা প্রকাশিত হয়েছে তাঁর *কালান্তর* প্রবন্ধাবলীর অর্ন্তগত 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে:

> মস্কৌ শহরে গিয়ে রাশিয়ার শাসনকার্যের একটা অসাধারণতা আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছিল– দেখেছিলেম, সেখানকার মুসলমানদের সঙ্গে রাষ্ট্র অধিকারের ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে অমুসলমানদের কোনো বিরোধ ঘটে না, তাদের উভয়ের মিলিত স্বার্থসম্বন্ধের ভিতরে রয়েছে শাসনব্যবস্থার যথার্থ সত্য ভূমিকা। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪২৫: ৪১১)

চিনা বিপ্লবের পূর্বে শাসক চিয়াং কাইশেকের সময়ে ধর্মকে ব্যবহার করা হতো শোষণের হাতিয়ার হিসেবে। পূর্বে কিভাবে ধর্মকে ব্যবহার করে শাসকশ্রেণী স্বার্থ উদ্ধার করেছিল এবং গণআন্দোলন দমানোর জন্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা লাগিয়ে রাখত তার বিশদ বর্ণনা *আমার দেখা নয়াচীন* গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। বঙ্গবন্ধু, বৌদ্ধধর্ম অধ্যুষিত চীনের বিপ্লব পূর্ববর্তী সরকার অন্য ধর্মে বিশ্বাসীদের কিভাবে অত্যাচার করত তার প্রতি গভীর মনোনিবেশ করেছেন। দমন নিপীড়ন বন্ধে সরকারের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা সম্পর্কে তিনি বলেন- "চিয়াং কাইশেক সরকার এই অত্যাচার কোনদিন বন্ধ করতে পারে নাই অথবা চেষ্টা করে নাই"। (শেখ মুজিবুর রহমান ২০২০: ১১২) তবে চিয়াং কাইশেকের সময়ে ধর্ম নিয়ে যে অপরাজনীতি তা বিপ্লবোত্তর সময়ে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। নয়াচীন প্রতিষ্ঠার পর সরকার দাঙ্গা নির্মূলে কঠোরভাবে মনোযোগ দিয়েছিলেন বিধায় লেখক ভ্রমণের সময়সূচি পর্যন্ত কোন ধরনের ধর্মকেন্দ্রিক অপ্রীতিকর ঘটনা অবলোকন করেন নি বলে স্বীকার করেন। এমনকি ধর্ম নিয়ে যারা রাজনীতি করার চেষ্টা করেছে, "সরকার কঠোরভাবে তাদের শায়েস্তা করে দিয়েছে" বলে জানান । (২০২০: ১১২) ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

বজায় রাখতে নয়াচীন সরকার রাষ্ট্রীয়ভাবে বড় বড় ধর্ম সমূহের জন্য কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন[৩] প্রতিষ্ঠা করেছে। যেমন- অল চায়না ইসলামিক কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন, ক্রিস্টান কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন এবং বৌদ্ধ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন। কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার ফলাফল বঙ্গবন্ধু উল্লেখ করেছেন এভাবে, "আজ আর কোন কুসংস্কার চীন দেশে নাই। ধর্মের দোহাই দিয়ে সেখানে আজ রাজনীতি চলে না"।(শেখ মুজিবুর রহমান ২০২০: ১১৪) একটি নির্দিষ্ট ধর্মে বিশ্বাসী কেউ যেন রাষ্ট্রীয় চাকুরী বা সুযোগ-সুবিধা বেশি না পায় তার জন্যও নয়াচীন সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করে। যোগ্যতা, সক্ষমতা এবং শিক্ষাকে প্রধান হাতিয়ার করেই সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হয়। বিপ্লবের অল্প কয়েক বছরের ব্যবধানে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা অন্যান্য দেশের তুলনায় যেভাবে নিশ্চিত করেছে তাতে লেখক অভিভূত হন। শেখ মুজিবুর রহমান নয়াচীনের ধর্মীয় সম্প্রীতিকে মোটাদাগে নিরূপণ করেছেন এভাবে- "নয়াচীন সকলকেই মানুষ হিসাবে বিচার করে; কে কোন ধর্মের তা দিয়ে বিচার হয় না। তাই নয়াচীন সরকার সকল সম্প্রদায়ের জনসাধারণের সমর্থন পেয়েছে"। (২০২০: ১১৫)

দুটি গ্রন্থেই স্বদেশ উন্নয়ন ভাবনা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। *রাশিয়ার চিঠিতে* স্বদেশকে এগিয়ে নেওয়ার যে প্রত্যয় তা রাশিয়ার প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ চিত্রিত করেছেন। সোভিয়েত রাশিয়া শিক্ষা, সংস্কৃতি, কৃষি এবং সকল ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধন করেছে তার মূলে রয়েছে স্বদেশের আলো, বাতাস ও মাটির প্রতি গভীর অনুরাগ। সোভিয়েত রাশিয়াতে দেশের যে কোন কর্মকাণ্ডে জনগণকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে তাদের মধ্যে কর্মস্পৃহা তৈরি করা হয়, যা একটি দেশের উন্নতিতে জনগণের মধ্যে অংশীদারিত্বের মনোভাব তৈরি করে। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন, সোভিয়েত রাশিয়ায় "সাধারণের কাজ, সাধারণের চিত্ত, সাধারণের স্বত্ব ব'লে একটা অসাধারণ সত্তা এরা সৃষ্টি করতে লেগে গেছে"। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০১২: ২৮) তাছাড়া, দেশকে ভালোবেসে সকল মানুষের উন্নতির প্রচেষ্টাও রাশিয়াতে লক্ষণীয়। রাষ্ট্রব্যবস্থা, এই উন্নতির বাহনকে পাঞ্জেরীর ন্যায় সম্মুখপানে এগিয়ে নিচ্ছে বীরদর্পে। রাষ্ট্রীয় ভাষায় শিক্ষা কার্যক্রম সরকারি উদ্যোগে চালু করার মাধ্যমে প্রান্তিক মানুষের মধ্যে স্বদেশ প্রেম জাগ্রত করার প্রয়াস রাশিয়ার ক্ষেত্রে একটি চোখ-ধাঁধানো দৃষ্টান্ত। যেমন- "অনেক দেশে আরবী অক্ষরের চলন থাকাতে শিক্ষা বিস্তারে বাধা হচ্ছিল, সেখানে রোমক বর্ণমালা চালিয়ে দেওয়াতে শিক্ষার কাজ সহজ হয়েছে"। (২০১২: ৩৯)।

তাছাড়া, অক্টোবর বিপ্লব সোভিয়েতবাসীকে আর্থ-সামাজিকভাবে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দান করেছে। তবে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বহুদিনের শোষণে পীড়িত সমাজ ব্যবস্থার বিনাশপূর্বক নতুন যে যুগের সূচনা ঘটেছিল তার নবজাগরণের লক্ষ্যে সোভিয়েতবাসী কর্মতৎপর হয়েছে। সোভিয়েত রাশিয়ার পুনর্জাগরণে সোভিয়েতবাসীর ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ও ত্যাগ স্বীকারের যে উদার মনোবৃত্তি তার পরিচয় বিবৃত হয়েছে ককেশীয় যুবতীর জবানিতে:

[৩] মূলত ধর্মীয় শিক্ষার বিস্তার এবং ধর্মীয় কুসংস্কার দূর করা ছিল অ্যাসোসিয়েশনগুলোর প্রধানতম দায়িত্ব।

> অক্টোবর বিপ্লবের পর থেকে আমরা যথার্থ স্বাধীনতা এবং সুখ পেয়েছি। আমরা নতুন যুগ সৃষ্টি করতে প্রবৃত্ত, তার কঠিন দায়িত্ব খুবই বুঝি, তার জন্য চূড়ান্ত রকমের ত্যাগ স্বীকার করতে আমরা রাজি। (২০১২: ২১)

এভাবে, শিক্ষা, সংস্কৃতি, কৃষি ও যন্ত্রের সমন্বিত ব্যবহারের মাধ্যমে সোভিয়েত নাগরিকদের মধ্যে গড়ে ওঠে স্বজাতীয় দেশাত্মবোধের এক মহাসম্মিলন। আর এই স্বদেশ প্রেমের কারণেই রাষ্ট্র হয়ে উঠেছে প্রত্যেক নাগরিকের। ফলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং শোষণহীন নীতি প্রতিষ্ঠিত হয় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে।

অপরদিকে, নয়াচীনের স্বদেশপ্রেমের চিত্র বঙ্গবন্ধুর আলোচনায় নানানভাবে বিধৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে লিঙ্গভেদে নাগরিকের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা, স্বদেশী ভাষা ও স্বদেশী পণ্য প্রীতি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বিপ্লবোত্তর নয়াচীনে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে বা উন্নয়ন পরিকল্পনা করা হয়েছে তার ভিত্তি মূলে রয়েছে নারী-পুরুষ ভেদে সমতা আনয়ন করা। তাছাড়া সমানাধিকার যে ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে কথা বঙ্গবন্ধু স্বীকার করেছেন এভাবে, "নয়াচীনে পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার কায়েম হওয়াতে আজ আর পুরুষ জাতি অন্যায় ব্যবহার করতে পারে না নারী জাতির ওপর।" (শেখ মুজিবুর রহমান ২০২০: ৯৯) দেশের ও মাতৃভাষার প্রতি নয়াচীনের দরদ পরিলক্ষিত হয়েছে রাষ্ট্রীয় ভাষা এবং শিক্ষার নানামুখী উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে। পাঠদান, অভ্যর্থনা এবং রাষ্ট্রীয় আচারে মাতৃভাষার প্রতি দেওয়া হয়েছে অপরিসীম গুরুত্ব। বঙ্গবন্ধু তার অনুভূতি প্রকাশ করেছেন এভাবে, "একেই বলে জাতীয়তাবোধ। একেই বলে দেশের ও মাতৃভাষার উপরে দরদ।" (২০২০: ৪৪) গণমুখী, কর্মমুখী এবং সামগ্রিক শিক্ষা তথা কৃষি শিক্ষা, শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনিক্যাল শিক্ষার বন্দোবস্ত করা হয়েছে একেবারে বিপ্লব পরবর্তীতে। শিক্ষার প্রসারে সামগ্রিক প্রচেষ্টার ফলাফল *আমার দেখা নয়াচীন* গ্রন্থে ফুটে উঠেছে এভাবে, "মাত্র চার বৎসরে তারা শতকরা ৩০ জন লোককে লেখাপড়া শিখিয়ে ফেলেছে। গর্ব করে আমাকে আবার বললো (বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মি. হালিম), '১০ বৎসর পরে যদি চীনে আসেন তবে দেখবেন একটা অশিক্ষিত লোকও নাই'।" (২০২০: ৬০) যাহোক, মাতৃভাষার প্রতি আবেগ এবং শিক্ষার সামগ্রিক বিস্তারে চীনের রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ এবং সেগুলো গ্রহণে ও বাস্তবায়নে নয়াচীনবাসীর একাগ্রতা ফুটে উঠেছে শেখ মুজিবুর রহমান ও তৎকালীন চীনা স্বাস্থ্যমন্ত্রী মি. বোরহান শহীদের আলাপচারিতায়, "এদেশের লোকের মনে অহংকার নাই। সকলকেই আপন করতে চায়। সকলেই মনে করে 'রাষ্ট্র আমাদের', একে গড়ে তুলতে হবে।" (২০২০: ৬৪) নিজস্ব শিল্পের অগ্রগতি চীনে সম্ভব হয়েছে শুধু স্বদেশী পণ্য ব্যবহার এবং পণ্যের প্রতি আকর্ষণ থেকে। নয়াচীনে বিদেশী পণ্য জনগণের মনোজগতকে আকর্ষণ করতে পারে নি। যার প্রমাণ মেলে বঙ্গবন্ধুর সাথে এক চীনা দোকানির সাক্ষাতে, "আমাদের দেশের জনগণ বিদেশি মাল খুব কম কেনে। দেশি মাল থাকলে বিদেশি মাল কিনতে চায় না, যদি দাম একটু বেশিও দিতে হয়।" (২০২০: ৭৬) ফলে দেশে শিল্প কারখানা গড়ে

তোলার মাধ্যমে একদিকে হাজার হাজার লোকের যেমন কর্মসংস্থান হয়েছে অন্যদিকে স্বদেশী পণ্যের ব্যবহার এবং বাজারজাতকরণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটেছে। আর এভাবে চীন রাষ্ট্রে স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের এক বিস্ময়কর মেলবন্ধন প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

সামাজিকভাবে পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর জন্য দুটি রাষ্ট্রেই নানামুখী কর্মসূচি ও পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নকল্পে রাশিয়া অনুন্নত প্রদেশগুলোর উন্নয়নে (যেমন: তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান) বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করলেও নয়াচীন শ্রেণি ও পেশাভেদে (যেমন: ভিক্ষুক, পতিতা, রিকসাওয়ালা) পশ্চাৎপদদের দিকে দৃষ্টি দিয়েছে। সোভিয়েত রাষ্ট্রসঙ্ঘের সর্বাধিক নবীন সদস্য ও পিছিয়ে থাকা তুর্কমেনিস্থান ও উজবেকিস্থানের আর্থ-সামাজিক অবস্থা রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন এভাবে "নানা কারণে খেতের অবস্থা ভালো নয়, পশুপালনের সুযোগ ও তদ্রুপ"। বুলেটিনের বরাত দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তুর্কমেনিস্তানের ভৌগলিক অবস্থান আলোচনা করে বলেন, "বিরলবসতি জনসংস্থান দূরে দূরে, দেশে রাস্তার অভাব, জলের অভাব, লোকালয়ের মাঝে মাঝে বড় বড় মরুভূমি, লোকের আর্থিক দূরবস্থা অত্যন্ত বেশি"। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০১২: ৪২)

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের মধ্যে অনুন্নত রাষ্ট্র হল তুর্কমেনিস্তান। আর এই পিছিয়ে পড়া রাষ্ট্রকে উন্নত এবং প্রধান স্রোতধারার সাথে সংশ্লিষ্ট করতে বিপ্লবোত্তর সরকার নিয়েছে নানান গঠনমূলক উদ্যোগ ও কর্মসূচি। এক্ষেত্রে কারখানা খোলা; সুতার কল, রেশমের কল ও বৈদ্যুতজনন স্টেশন প্রতিষ্ঠা করা এবং কলগুলো পরিচালনায় যন্ত্রচালক শ্রমিক তৈরীর জন্য তুর্কমেনি শ্রমিকদের মধ্য-রাশিয়ার বড় বড় কারখানায় দক্ষতা অর্জন এবং শিক্ষার কাজে পাঠানো ছিল উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গ্রন্থে কীভাবে তুর্কমেনিস্তানের নাগরিকদের শিক্ষিত করা হয়েছে সে বিষয়েও আলোকপাত করেছেন:

> মস্কৌ শহরে নদীতীরে সাবেক কালের একটি উদ্যানবেষ্টিত সুন্দর প্রাসাদে তুর্কমেনদের জন্যে শিক্ষক শিক্ষিত করবার একটি বিদ্যাভবন[8] (Turcomen People's Home of Education) স্থাপিত হয়েছে। সেখানে সম্প্রতি একশো তুর্কমেন ছাত্র শিক্ষা পাচ্ছে, বারো-তেরো, বছর তাদের বয়স। এই বিদ্যাভবনের ব্যবস্থা স্বায়ত্তশাসননীতি-অনুসারে। এই ব্যবস্থার মধ্যে কতকগুলি কর্মবিভাগ আছে। যেমন স্বাস্থ্যবিভাগ, গার্হস্থ্যবিভাগ (household commission), ক্লাস-কমিটি। (২০১২: ৪২)

[8] বিদ্যাভবনগুলোর ব্যবস্থা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন: ''বিদ্যাভবনে নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে অধ্যক্ষসভা যা প্রত্যেক বিভাগ থেকে নির্বাচিত সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। এ সভার প্রতিনিধিরা স্কুল কাউন্সিলে ভোট প্রদানের অধিকার পায়।'' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০১২: ৪২)

তুর্কমেনিদের সংস্কৃতি চর্চার জন্য সেখানে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বিভিন্ন ক্লাব[৫]। এছাড়া তুর্কমেনিস্তানের কৃষির উন্নয়নকে রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন একান্ত সাদামাটাভাবে। কৃষি চাষের উন্নতি আনয়নের জন্য বহুসংখ্যক কৃষিবিদ্যায় পারদর্শীদের তুর্কমেনিস্তানে পাঠানো হয়। দরিদ্রতম কৃষক পরিবার যেন কৃষির খেত, সেচ ও কৃষি যন্ত্র পায় তার জন্য ২০০'শর বেশি আদর্শ-কৃষি ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এমনকি অনুন্নত দেশ হওয়ার কারণে স্বাস্থ্যসেবার প্রতি দেওয়া হয়েছে অপরিসীম গুরুত্ব। লেখকের ভ্রমণ অবধি সেখানে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সেবার জন্য খোলা হয়েছিল ১৩০ টি হাসপাতাল যেখানে ডাক্তারের সংখ্যা ছিল ৬০০।

শুধু শিক্ষা, কৃষি এবং স্বাস্থ্যের প্রতি গুরুত্ব নয় তুর্কমেনিস্তানে উন্নতি নিশ্চিত করার অভিপ্রায়ে সেখানে আধুনিকায়ন এবং অজ্ঞতা দূর করার জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে বিভিন্ন আইন পাশ করা হয় এবং আচার-প্রথারও প্রচলন করা হয়। এর প্রমাণ, গ্রন্থের লেখকের উদ্ধৃত একটি বুলেটিনের বরাতে জানা যায়:

> We can boost of some attainments in the field of modernization and the struggles against crass ignorance, though again we must warn the reader that Turcemenistan, being on a very low level of civilization, has preserved a good many customs of the distants past. However, the recent laws, passed in order to combat the selling of women into marriage and child marriages, had produced the desired effect.

আমার দেখা নয়াচীন গ্রন্থে ভিক্ষুক এবং পতিতাদের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর অংশ হিসেবে চিহ্নিতকরণপূর্বক তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সরকার কিভাবে কাজ করেছে সেদিকে নজর দেওয়া হয়েছে। ভিক্ষাবৃত্তির ব্যাপকতার কারণে লেখক নয়াচীনের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে, "এদেশ একদিন ভিক্ষার জন্য বিখ্যাত ছিল"। এ পূর্ব ধারণা লেখকের মনে ছিল বিধায় তিনি নয়াচীন ভ্রমণের পর অনেক নগর, গ্রাম, মহল্লা, পাড়া, স্টেশন এবং বড় বড় শহর ঘুরেও কোন ভিক্ষুক দেখতে পাননি। লেখক ভিক্ষুক খুঁজে না পেয়ে বিস্মিত হলেন এবং তাদের কিভাবে উন্নয়ন করা হলো তা জানতে আগ্রহী হলেন। পুনর্বাসন এবং কর্মমূখী করার মাধ্যমে নয়াচীনে যেভাবে ভিক্ষাবৃত্তি দূর করা হয়েছে তা *আমার দেখা নয়াচীন* গ্রন্থে এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে:

> "সরকার প্রত্যেক বড় বড় শহরে এবং জেলায় জেলায় ভিক্ষুকদের জন্য 'হোম' করেছে। যাকে এক কথায় 'ওয়ার্ক হাউজ' বলা হয়। সমস্ত ভিক্ষুককে ধরে সেই ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়,

[৫] ''ক্লাবে অনেক সময়ে ছেলেরা নিজের ভাষায় নিজেরা নাট্যাভিনয় করে, গান বাজনার সংগত হয়। ক্লাবের একটি সিনেমা আছে, তার থেকে মধ্য-এশিয়ার জীবনযাত্রার চিত্রাবলী ছেলেরা দেখতে পায়। এছাড়া দেয়ালে টাঙ্গানো খবরের কাগজ বের করা হয়।'' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০১২: ৪২)

> তাদের কাজ দেওয়া হয়, কাজ করে খায়। বিনা কাজে খেতে পায়না। আর যাদের কাজ করার ক্ষমতা নাই যেমন অন্ধ, আতুর তাদের সরকারের পক্ষ থেকে খাবার দেওয়া হয়"। (শেখ মুজিবুর রহমান ২০২০: ৮৫)

অবশেষে গ্রন্থকার সন্তুষ্ট হলেন যে নয়াচীন সরকার 'ওয়ার্ক হাউজ' এর মত একটি বৃহৎ পরিকল্পনা করে নবীন দরিদ্র দেশ হওয়া সত্ত্বেও ভিক্ষাবৃত্তি প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। গ্রন্থ প্রণেতা যখন নয়াচীন ভ্রমণ করেছিলেন তখনো চীন দেশ পতিতাবৃত্তির জন্য সারা বিশ্বে বিখ্যাত ছিল। খেতে না পারা, বিবাহ না হওয়া, এবং চরিত্রহীন যুবকের সাথে প্রেমের মতো ঘটনাগুলো পতিতাবৃত্তির জন্য দায়ী বলে লেখক জানতে পারেন। পতিতাবৃত্তি সমাধানে নয়াচীন সরকারের পদক্ষেপগুলোকে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন এভাবে:

> এই বেশ্যাবৃত্তির বিরুদ্ধে নয়াচীন সরকার জেহাদ ঘোষণা করলো। আইন করে না, মানবীয় ব্যবহার দ্বারা। সমাজসেবক ও নিঃস্বার্থ কর্মীদের উপর ভার পড়ল এই মেয়েরা কেন বেশ্যা হয় এবং এমন কুৎসিতভাবে জীবনযাপন করে অনুসন্ধানে তা বের করার! এরা কিছুদিন পর্যন্ত তাদের অনেকের জীবনের ইতিহাস সংগ্রহ করেছিল। আর একদিকে সরকার একটা কমিটি নিয়োগ করলো- কী করে এদের কাজ দেওয়া যায়, সমাজে পুনর্বাসন করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ দিতে। (২০২০: ৯৫)

পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নে সরকারিভাবে কয়েক ধাপে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। যেমন- বেশ্যার সংখ্যা গণনা, কাজের ব্যবস্থা এবং জীবন নষ্ট না করে ফ্যাক্টরিতে কাজে যোগদান সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা। বঙ্গবন্ধু বাস্তবায়ন পর্যায় শেষে ফলাফল বিশ্লেষণে লেখেন:

> প্রথমে শতকরা ৩০ জন বেশ্যা, বেশ্যাবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে কাজ নিতে রাজি হলো। তাদের সকলের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হলো, তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে ফ্যাক্টরিতে কাজ দেওয়া হলো। কয়েক মাস পরে আবার কর্মীরা বাকি বেশ্যাদের কাছে যেয়ে বোঝাতে লাগলো এবং বললো, তোমরা দেখে আসো আগে তোমাদের সাথে যারা ছিল তাদের অবস্থা কেমন করে ফিরে গেছে। তারা সংসারে স্থান পেয়েছে, অনেকের বিবাহ হয়েছে, বাড়ি পেয়েছে। তাদের অবস্থার কত পরিবর্তন হয়েছে। সে সময় আরো প্রায় শতকরা ৩০ জন বেশ্যাবৃত্তি ছেড়ে ফ্যাক্টরিতে কাজ নিলো। কিন্তু যে সমস্ত বেশ্যা বাকি ছিল তারা কিছুতেই আসতে রাজি হয় নাই। অনেকে পালাইয়া চলে গেল হংকং ও চীনের বাইরে, অনেকে গা ঢাকা দিল।(২০২০: ৯৮)

সর্বোপরি বলা যায় যে, *রাশিয়ার চিঠি* এবং *আমার দেখা নয়াচীন* গ্রন্থ দুটি পৃথক দু'টি দেশের প্রেক্ষাপটে রচিত হলেও উভয় ক্ষেত্রে লেখকদ্বয়ের স্বদেশ ভাবনার বিষয়গুলো স্থান পেয়েছে। উল্লেখ্য, লেখকদ্বয়ের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অভিজ্ঞতায় রয়েছে অসাধারণ অন্তমিল যেমন উভয়েই সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, শাসন ও বঞ্চনার ইতিহাস অবলোকন করেছেন গভীরভাবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন সাহিত্যিকের পাশাপাশি ছিলেন একজন সমাজ সংস্কারক, আর এ পরিচয়ে ভারতবর্ষের উন্নয়নে যেমন তাঁর তাত্ত্বিক ভাবনার নিদর্শন রয়েছে তেমনি সমাজ জাগরণমূলক নানান কর্মসূচিতেও তাঁর রয়েছে অপরিমেয় অবদান । অপরদিকে, বঙ্গবন্ধু একজন রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আরোহনের পর তিনি সোভিয়েত রাশিয়া ও চীনের উন্নয়ন ভাবনা ও রাষ্ট্রীয় দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বহুলাংশে। যেহেতু ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ রাষ্ট্রেরও অভ্যুদয় ঘটেছিল বিপ্লব তথা একটি স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার এ তিনটি মূল মন্ত্রকে ধারণ করে। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে রাষ্ট্র পরিচালনায় বঙ্গবন্ধু এ তিনটি মূলনীতি বাস্তবায়ন করেছিলেন সাংবিধানিকভাবে। উভয় ক্ষেত্রে গ্রন্থ রচয়িতাদ্বয় দুটি দেশের চলমান উন্নয়ন যেমন অবলোকন করেছেন তেমনি তাঁদের স্বদেশ কতটা পশ্চাৎপদতায় রয়েছে সে বিষয়গুলোও পর্যালোচনা করেছেন। সোভিয়েত রাশিয়া ও নয়াচীন বিপ্লবোত্তর রাষ্ট্র গঠন ও জাতি গঠনে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি সহ সকল ক্ষেত্রে কিভাবে গভীর মনোনিবেশ করেছিল এবং উভয় দেশের কর্মসূচিতে যে সাদৃশ্য বিদ্যমান ছিল তা অনুসন্ধান করাই এ প্রবন্ধের বিশেষ বিবেচ্য। সাহিত্যিক বিচারে গ্রন্থ দুটি ভারতবর্ষ ও স্বাধীন পাকিস্তানের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে জানার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ

1. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৭০) *রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক (তৃতীয় খণ্ড ১৯১৮-১৯৩৪)*, বিশ্বভারতী (ভারত)।
2. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১২), *রাশিয়ার চিঠি*, দি স্কাই পাবলিশার্স (১৪২৫), *কালান্তর*, বিশ্বভারতী (ভারত)।
3. শেখ মুজিবুর রহমান (২০২০), *আমার দেখা নয়াচীন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
4. হায়দার আকবর খান রনো (২০১৪), *ফরাসি বিপ্লব থেকে অক্টোবর বিপ্লব*, তরফদার প্রকাশনী।
5. Allan Bullock and Stephen Trombley, ed. (1999), The New Fontana Dictionary of Modern Thought, Third Edition.
6. Modern Review (1918), July 18.